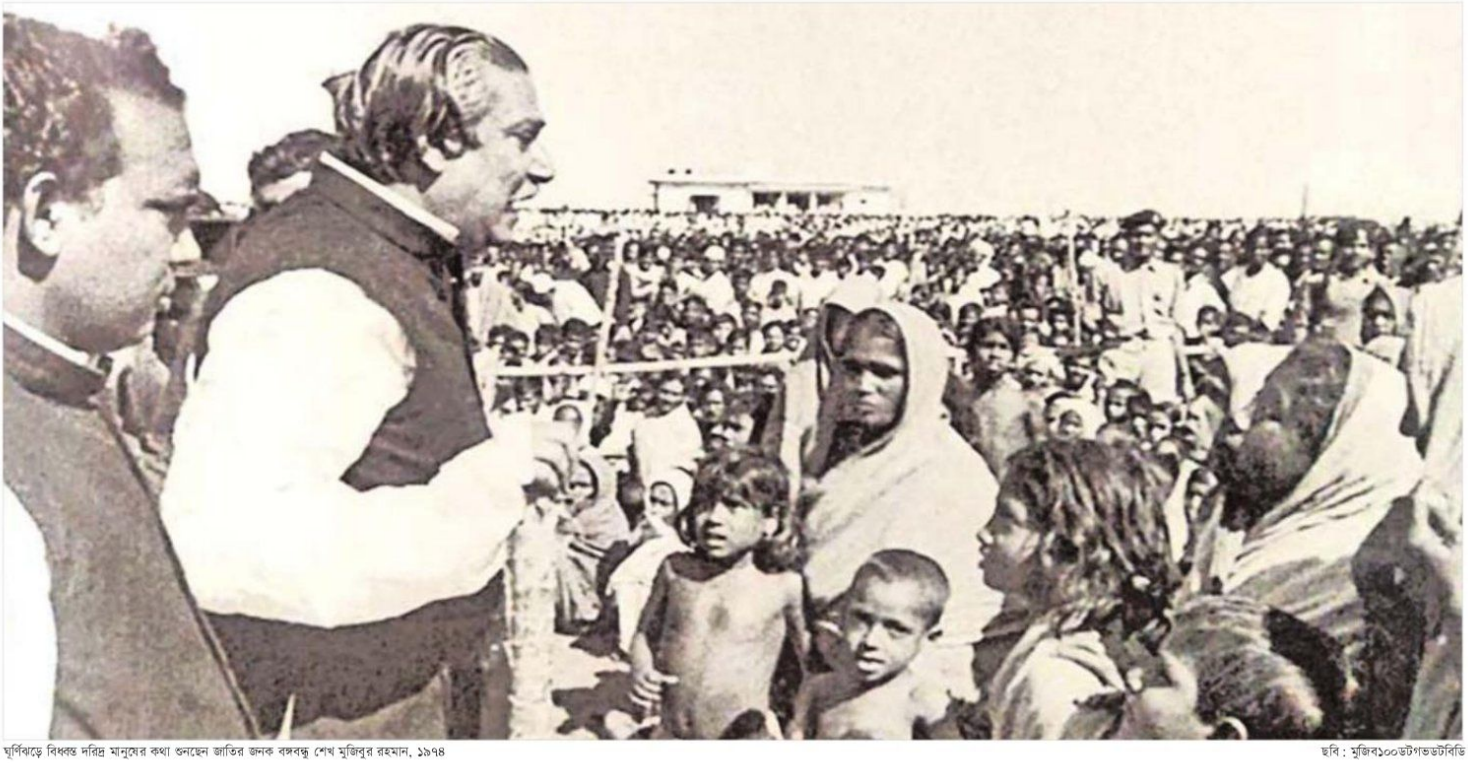

ঘূর্ণিঝড়ে বিধ্বস্ত দরিদ্র মানুষের কথা শুনছেন জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান, ১৯৭৪

ছবি : মুজিব১০০ডটগভডটবিডি

বঙ্গবন্ধু অবাধ বাজার অর্থনীতিতে বিশ্বাসী ছিলেন না

ড. মোহাম্মদ ফরাসউদ্দিন

জাতির পিতাকে ঘিরে রহস্য রোমাঞ্চ আছে। তিনি কি একজন সমাজতন্ত্রী ছিলেন। বঙ্গবন্ধুর আস্থাভাজন ও শ্রদ্ধার আসনে থাকা দুনিয়াখ্যাত অর্থনীতিবিদ প্রফেসর নুরুল ইসলাম (পরিকল্পনা কমিশনের ডেপুটি চেয়ারম্যান, মন্ত্রী) বলেছেন, '১৯৭২ সালে জাতীয়করণ নীতি নিয়ে ক্যাবিনেটে আলোচনার সময় দুই শিবিরের মধ্যে বিভেদ স্পষ্ট ছিল। ক্যাবিনেটের বাইরে জাতীয়করণের পক্ষে সবচেয়ে শক্তিশালী চাপ সৃষ্টিকারী গোষ্ঠী ছিল ছাত্র ও শ্রমিকরা, যারা সে সময় দারুণ প্রতিবাদী। বঙ্গবন্ধু অনেকটাই এদের পক্ষে ছিলেন। কারণ তিনি তার নির্বাচনী প্রতিশ্রুতির প্রতি সৎ থাকা কর্তব্য বলে মনে করেছিলেন। সমাজতন্ত্রের প্রতি নিজের অঙ্গীকারের কথা বারবার তিনি জনসমক্ষে প্রচার করেছিলেন। জাতীয়করণ নীতিতে আপস করা তার জন্য কঠিন ছিল।' (বণিক বার্তা, ২৯ জুলাই ২০১৮)

বঙ্গবন্ধুর আরেকজন অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ সহচর ও সহযোদ্ধা প্রফেসর রেহমান সোবহান (সদস্য, শিল্প, বাংলাদেশ পরিকল্পনা কমিশন) রেদোয়ান মুজিব সিদ্দিক কর্তৃক সম্পাদিত অতিশয় বিশ্বমানের সাময়িকী হোয়াইটবোর্ডে (স্বাধীনতার তীর্থস্থান বাড়ি ৬৭৭, সড়ক ৩২, ধানমন্ডি থেকে প্রকাশিত) ড. রওনক জাহানের সাথে যৌথভাবে লিখেছেন,

'...nationalization and the extension of the public sector by the development of the corporate enterprises and by the evolution of new institutional arrangements such as worker participation in the equity and management of industrial enterprises' (Mujib's economic policies and their relevance today: by Rounaq Jahan and Rehman Sobhan- Cover Story White Board March 20.

আমার এ দুজন শিক্ষক এবং আরো অনেকেই জাতির পিতাকে একজন সাচ্চা সমাজতন্ত্রী হিসেবে তুলে ধরেন বটে; কিন্তু আমি ভিন্নমত পোষণ করি। বঙ্গবন্ধু আসলে পোড় খাওয়া একজন জনদরদি রাজনীতিক, যিনি বাঙালি ধ্যানধারণা, চিন্তাচেতনার সাথে গভীরভাবে পরিচিত ছিলেন। তাই সুজলা সুফলা শস্য শ্যামলা এই সোনার বাংলায় সমাজতন্ত্রী না হয়ে একজন প্রয়োগবাদী (প্র্যাগমেটিক) স্নেহশীল অভিভাবক হিসেবে আবির্ভূত হন। সংবিধানের চারটি স্তম্ভের অন্যতম তিন সমাজতন্ত্র; সেই মহান দলিলের ১৩ নং অনুচ্ছেদে বাংলাদেশের সহায়-সম্পত্তির মালিকানা তিন ধরনের—রাষ্ট্রীয়, ব্যক্তিগত ও সমবায়ী হবে বলে উল্লেখ করা আছে। সমাজতন্ত্রে কিন্তু অল মিনস অব প্রডাকশন আর ওনড বাই দ্য স্টেট। তবে সমাজতন্ত্রের অন্যতম নির্যাস সমতাপ্রবণ বিতরণে টেকসই উন্নয়ন আর বৈষম্য নির্মূলে জাতির পিতার একটি কৃতসংকল্প সাধনা ছিল।

প্রয়োগবাদী হলেও মোটেও ধনতান্ত্রিক অবাধ বাজার অর্থনীতিতে বিশ্বাসী ছিলেন না বঙ্গবন্ধু। বৈষম্য তাকে ভীষণ পীড়া দিত। ২৬ মার্চ ১৯৭২ সালের ভাষণে তিনি সমতাপ্রবণ বণ্টন ব্যবস্থার প্রতি জোরদার বক্তব্য দেন। সংবিধানের অনেকগুলো অনুচ্ছেদে মানুষে মানুষে, নারী পুরুষে, ধনী নির্ধনে, গ্রামে শহরে বৈষম্য পরিহার করে সমতা প্রতিষ্ঠার কথা বলা হয়েছে। প্রথম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা (১৯৭৩-৭৮) দলিলে বলা হয়েছে যে দেশের বার্ষিক সামষ্টিক আয় বৃদ্ধির হারের তুলনায় কম বিতরণজনিত আয়ে বেশি প্রবৃদ্ধি করাতে হবে। প্রয়োজনে বিতরণজনিত ওপর বেশি হারে কর ধার্য করে সেই অতিরিক্ত রাজস্ব দিয়ে কিষান-কিষানী ও শ্রমজীবী মানুষের জন্য সুনির্দিষ্টভাবে কল্যাণকর অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ড চালাতে হবে। সমবায় ব্যবস্থা ছিল জাতির পিতার হৃদয়ের গভীরে। তার সেই বিখ্যাত উক্তি, 'ভাইয়েরা আমার, আসুন সমবায়ের জাদু স্পর্শে সুপ্ত গ্রামগুলোকে জাগিয়ে তুলি। নবসৃষ্টির উন্মাদনায় আর জীবনের জয়গানে তাকে মুখরিত করি।'

বঙ্গবন্ধু প্রয়োগবাদী হলেও মোটেও ধনতান্ত্রিক অবাধ বাজার অর্থনীতিতে বিশ্বাসী ছিলেন না। বৈষম্য তাকে ভীষণ পীড়া দিত। ২৬ মার্চ ১৯৭২ সালের ভাষণে তিনি সমতাপ্রবণ বণ্টন ব্যবস্থার প্রতি জোরদার বক্তব্য দেন। সংবিধানের অনেক অনুচ্ছেদে মানুষে মানুষে, নারী পুরুষে, ধনী নির্ধনে, গ্রামে শহরে বৈষম্য পরিহার করে সমতা প্রতিষ্ঠার কথা বলা হয়েছে

ক। স্থিতিপত্র বাংলাদেশ

১। বাংলাদেশ এখন সারা পৃথিবীতে সাড়া জাগানো অর্থনৈতিক উন্নয়নের মহাসড়কে দ্রুতগতিতে অগ্রসরমান। ১৯৭২ সালের ৮০০ কোটি ডলারের ক্ষুদ্র জিডিপি এখন ৩৪ হাজার ৫০০ কোটি মার্কিন ডলারের একটি বেশ বড় অর্থনীতি। ১৯৭০-৭১ অর্থবছরে সামষ্টিক আয়ে ছিল নেতিবাচক—১২ শতাংশ সংকোচন। আর করোনার ছোবলের আগ পর্যন্ত বার্ষিক জিডিপি প্রবৃদ্ধি শতকরা ৮ ভাগের ওপরে বিরাজমান ছিল। মাথাপিছু আয়ে ১৯৭২ সালে ৮৫ মার্কিন ডলার এখন ২ হাজার ২২৭ মার্কিন ডলারে। সামষ্টিক আয়ের

অনুপাত হিসেবে বহির্বাণিজ্যে ১৯৭২ সালে শতকরা ২ ভাগের কম ছিল। এখন তা বেড়ে দাঁড়িয়েছে শতকরা ৩৫ ভাগে। মোট সামষ্টিক আয়ে মাধ্যমিক খাতের অবদান ১৯৭২ সালে ছিল শতকরা ১৭ ভাগ। তার মধ্যে শিল্পোৎপাদনের অংশ ছিল শতকরা ৮ ভাগ। করোনা-পূর্ববর্তী সময়ে বার্ষিক সামষ্টিক আয়ে মাধ্যমিক খাতের অবদান ছিল শতকরা ৩৩ভাগ (শিল্পোৎপাদনে শতকরা ১৮ ভাগ)।

২। ১৯৭২ সালে ৭.৫ কোটি মানুষের মধ্যে ছয় কোটি ছিল দারিদ্রসীমার নিচে; করোনা-পূর্ববর্তী ২০২০-২১ সময়ে ১৬.৫০ কোটি জনসংখ্যার বাংলাদেশে দরিদ্র লোকের সংখ্যা ছিল ৩.১ কোটি। এ অর্ধশতকে জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার শতকরা ৩.৩ থেকে শতকরা ১.৩ হারে নামানো সম্ভব হয়েছে। এরই মধ্যে খাদ্যোৎপাদন ১.১ থেকে প্রায় চার কোটি টনে বৃদ্ধি করা সম্ভব হয়েছে। বাংলাদেশের জনগণের গড় আয়ুষ্কাল ৪৩ থেকে বেড়ে এখন ৭২ বছর। শিশুমৃত্যুর হার হাজারে প্রায় ২০০ থেকে ৩০-এর নিচে নামানো সম্ভব হয়েছে।

৩। ১৯৭২ সালের ৭৮৬ কোটি টাকার বাজেট এখন ৬ লাখ ৩ হাজার ৬৮১ কোটি টাকায় বৃদ্ধি পেয়েছে।

খ। মতাদর্শের উন্মেষ ও বিকাশ

৪। ওপরে বর্ণিত আর্থসামাজিক অগ্রগতি এবং হাল আমলে শিল্প ও বাণিজ্য সমৃদ্ধির বিবরণ এ নিবেদনের পরবর্তী অংশে আবারো উত্থাপন করা হবে। তবে এসবই যে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের প্রদর্শিত মত ও পথ ধরে সংঘটিত হয়েছে, সে বিষয়ে সন্দেহের কোনো অবকাশ নেই। কী সেই মত ও পথ, অর্থাৎ জাতির পিতার দর্শনের উদ্ভব ও বিকাশ এবং আজকের দিনে এর প্রাসঙ্গিকতার আলোচনা খুবই জরুরি। একই সাথে প্রয়োজন বঙ্গবন্ধুর রাজনীতির গভীরে প্রবেশ করা। কেন তিনি রাষ্ট্রীয় ক্ষমতায় যাওয়ার মাধ্যমে গরিব দুঃখী সাধারণ মানুষের অর্থনৈতিক দৈন্যদশা ও সামাজিক নিগ্রহ থেকে মুক্তির অন্বেষা ছোটবেলা থেকে শাহাদত পর্যন্ত লড়াই সংগ্রাম করেছেন। তাছাড়া যে মজবুত রাজনৈতিক দলকে লালন-পালন আর মহীরুহে করে স্বাধীনতা অর্জনের সাংগঠনিক বাহক হিসেবে শেখ মুজিবুর রহমান ব্যবহার করেছেন, তার মূল দর্শন, কালান্তরে এর বিবর্তন এবং বাংলাদেশ কৃষক শ্রমিক আওয়ামী লীগ বাকশালে আত্মস্থ হওয়ার বিবরণ বিশ্লেষণও জানা জরুরি।

৫। গোপালগঞ্জের টুঙ্গিপাড়ায় বাল্যকালে শেখ মুজিব মধুমতী তীরে প্রকৃতির নিবিড় সাহচর্যে বেড়ে ওঠেন। পিতা শেখ লুৎফর রহমান ছিলেন অত্যন্ত সৎ, স্বচ্ছ, সাহসী ও কর্তব্যনিষ্ঠ। মা সায়েরা খাতুন ধনাঢ্য পূর্বপুরুষের আমানত রক্ষার দৃঢ় নীতি থেকেও শিক্ষা গ্রহণ করেন মুজিব। গৃহশিক্ষক কাজী আব্দুল হামিদ ও প্রধান শিক্ষক রসরাজ সেনগুপ্তের কাছ থেকে কিশোর মুজিব পরোপকার এবং দুর্বলকে রক্ষা করার দীক্ষা পান। গুরু সদয় দত্তের ব্রতচারী আন্দোলনের মর্মার্থ অর্থাৎ হিংসা বিদ্বেষ ঈর্ষামুক্ত হয়ে পরধনে লোভী না হওয়ার বিষয়টি মুজিব চরিত্র গঠনে প্রভাব ফেলে। সুভাষ চন্দ্র বসুর স্বদেশী আন্দোলনের মাধ্যমে দেশ স্বাধীন করা যাবে এবং সমাজের নিচতলাদের কল্যাণ সাধন করা যাবে বলে তিনি বিশ্বাস করতেন। তবে সেই ত্রিশের দশক থেকেই শেখ মুজিব নেতাজির সশস্ত্র মুক্তি সংগ্রামের পরিবর্তে অহিংস সাংগঠনিক প্রক্রিয়ায় ইংরেজদের বিতাড়িত করা যাবে বলে মনে করতেন। ওই সময়টাতে পিতা শেখ লুৎফর রহমান কতিপয় আক্ষেপকারীকে বলেন, 'আমার সন্তান শেখ মুজিব দেশ ও মানুষের সেবা করে দেখে আমি আনন্দিত ও গর্বিত। সে কোনো অন্যায় করছে না, দেশমাতৃকার মুক্তির পথ অন্বেষায় তার জেল-জুলুম হলেও আমি তাকে সমর্থন করে যাব।' শেখ মুজিবের চিন্তাচেতনা ও আদর্শ গঠনে ও কিষান-কিষানীর প্রতি মমত্ববোধে প্রথা ভূমিকা রাখে। ১৯৩৮ সালে বাংলা প্রেসিডেন্সির প্রধানমন্ত্রী শেরেবাংলা এ কে ফজলুল হক ও শ্রমমন্ত্রী হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দী গোপালগঞ্জ সফরে এসে যুবক মুজিবের সংসাহস ও জনসেবা প্রবৃত্তি দেখে মুগ্ধ হন। সেই থেকে সোহরাওয়ার্দী তার রাজনীতির শিক্ষাগুরু। নিজের অজান্তে হলেও গরিব কৃষককুলের ঋণভার লাঘবে এবং তাদের অধিকার সুরক্ষার নীতিতে প্রভাবিত হন শেখ মুজিব। ইসলামিয়া কলেজ ও বেকার হোস্টেলে দার্শনিক অধ্যাপক সাইদুর রহমান এবং বঙ্গীয় মুসলিম লীগের প্রগতিশীল সাধারণ সম্পাদক আবুল হাশেম শেখ মুজিবের হৃদয় গভীরে জনসেবা ও অসাম্প্রদায়িক আদর্শের বীজ বপন করে দেন। ১৯৪৩ সালের মন্বন্তরের সময় কলকাতা ও গোপালগঞ্জে শেখ মুজিবুর রহমান বন্ধুবান্ধবদের নিবেদিতপ্রাণ সহযোগিতায় দুর্গত মানুষের পাশে দাঁড়ানোর স্থায়ী দীক্ষা গ্রহণ করেন। বেসামরিক সরবরাহ ও খাদ্যমন্ত্রী হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দী কর্তৃক চালু করা লঙ্গরখানা স্থাপন ও পরিচালনা শেখ মুজিবের দারিদ্র্য নির্মূলের দর্শন গঠনে সহায়তা করে। ১৯৪৬ সালের মারাত্মক সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার সময় অকুতভয় শেখ মুজিব দাঙ্গারত উভয় সম্প্রদায়কে বলেন, 'এটা হিন্দু-মুসলিম বিরোধ নয়, বরং সমন্বিত শক্তিতে উপনিবেশবাদী ইংরেজ শত্রুদের বিতাড়নে ঐক্যবদ্ধ হওয়ার সময় এটি।' কলিকাতা করপোরেশনের মেয়র দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাস, ডেপুটি মেয়র এইচএস সোহরাওয়ার্দী ও মুখ্য নির্বাহী সুভাষ চন্দ্র বসুর নিয়ম-নীতি : সংখ্যা সাম্য অর্জিত না হওয়া পর্যন্ত করপোরেশনের সব নিয়োগে ৬০ শতাংশ পদে মুসলমানদের নেয়া হবে। শেখ মুজিব অসাম্প্রদায়িক চেতনায় মুগ্ধ হন।

গ। ভাষা আন্দোলনের সূচনা। বৈষম্যের পাহাড়

৬। পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার পর পরই কেন্দ্রীয় শিক্ষামন্ত্রী ফজলুর রহমান (পূর্ব বাংলার লোক!) করাচিতে শিক্ষা সম্মেলনের আয়োজন করান, রাষ্ট্রভাষা উর্দুর পক্ষে কৌশল নির্ধারণের জন্য। এমনকি বাঙালি মায়ের মুখের ভাষাকে আরবি অথবা রোমান হরফে লেখারও ঘৃণিত প্রস্তাবে ফজলুর রহমানই উসকানি দেন। দেখা গেল দেশের শতকরা ৫৬ ভাগ অধ্যুষিত পূর্ব বাংলার ভাগে রাজনীতি, প্রশাসন, সম্পদ বরাদ্দ, সশস্ত্র বাহিনী কেন্দ্রীয় আমলা বহরে নিয়োগ শতকরা ১৫-২০ ভাগ মাত্র। এদিকে পূর্ব বাংলাকে পশ্চিম পাকিস্তান থেকে সব পণ্য বিশ্বমূল্যে কিনতে হতো। আর পূর্ব বাংলার চাল, পাট, কাগজ, নিউজপ্রিন্ট, লবণ, দেশলাই বিপুল ভর্তুকি মূল্যে কিনে নিত করাচির শাসককুল। পঞ্চাশের দশকের শুরুতে বারবার বিধ্বংসী বন্যায় পূর্ব বাংলার ফসল নষ্ট হতো এবং প্রাণহানি ঘটে যেত। পাকিস্তানিরা কিছুতেই ত্রুণ মিশন বাস্তবায়ন করে পূর্ব বাংলার বন্যা নিয়ন্ত্রণে অর্থ বরাদ্দ করেনি। এদিকে কোরিয়া যুদ্ধে ঝোমা বানাতে জুতসই পাটের আঁশ উচ্চমূল্যে রফতানি করা হতো। সোনালি আঁশ নামে তখন থেকেই পরিচিত হয় পাট। চট্টগ্রাম বন্দরে জাহাজে ওঠা পাটের বৈদেশিক মুদ্রায় উচ্চমূল্য দিয়ে মূলধন যন্ত্রপাতি ও শিল্পে ব্যবহৃত কাঁচামাল কিনে তা করাচি বন্দরে নামানো হতো পশ্চিম পাকিস্তানের শিল্পায়ন ও অর্থনৈতিকভাবে মজবুত করার জন্য। এদিকে পাকিস্তান গণপরিষদের সদস্য ধীরেন্দ্র নাথ দত্ত শতকরা ৫৬ ভাগ মানুষের ভাষা বাংলায় পরিষদের কার্যবিবরণী লিপিবদ্ধ করার দাবি উত্থাপন করলে পূর্ব বাংলার কোনো মুসলিম লীগ সদস্যই এ প্রস্তাব সমর্থন করেননি। ১৯৪৭ সালের আগস্টে গণপরিষদ গঠিত হলে পূর্ব বাংলা দেশদ্রোহিতেই মহানুভবতা প্রদর্শন করে ছয়জন উর্দুভাষীকে এ প্রদেশের কোটায় গণপরিষদ সদস্য করতে সম্মত হয়। প্রধানমন্ত্রী লিয়াকত আলী খান এ ছয়জনের একজন। ভারত থেকে আসা উচ্চপদস্থ বহুসংখ্যক উর্দুভাষী কর্মকর্তাকে পূর্ব বাঙলার কোটায় নিয়োগ দেয়া হয়। এমনকি চৌকস বাঙালি প্রবীণতর কর্মকর্তা গোলাম মুরশিদকে ডিঙিয়ে পূর্ব বাংলার চিফ সেক্রেটারি হিসেবে কট্টরপন্থী 'মাউরা' আজিজ আহমেদকে পদায়ন করা হয়। আজিজ আহমদ করাচিতে বার্ষিক গোপনীয় রিপোর্টে পূর্ব বাংলার বাংলাভাষী মন্ত্রীদের বিরুদ্ধে তথ্য পাঠাতেন।

ঘ। বঙ্গবন্ধুর দর্শন : রাজনীতি, অর্থনীতি, সমাজনীতি, কূটনীতি

৭। একটি পশ্চিমা ধাঁচের উদার গণতান্ত্রিক দল হিসেবে আত্মপ্রকাশ করা আওয়ামী লীগের অভ্যন্তরে বাম ধারার একটি শক্তিও ছিল। '৫৪-এর নির্বাচনে অনেক কমিউনিস্ট ও বাম ধারার নেতাকর্মী হুলিয়া থেকে বের হয়ে আওয়ামী লীগে যোগ দেন। সামরিক চুক্তিতে পাকিস্তানের থাকা না থাকা নিয়ে দলটিতে মতদ্বৈধতা ও বিতর্ক এমনিতে ছিল। ১৯৫৭ সালে কাগমারী সম্মেলনের পর মাওলানা ভাসানী সমাজতন্ত্রে বিশ্বাসী অংশটিকে নিয়ে আলাদা হয়ে গেলে শেখ মুজিবুর রহমান মূলধারায় সোহরাওয়ার্দী সাহেবের নেতৃত্বে উদার গণতান্ত্রিক অংশকে বলিয়ান করতে সচেষ্ট হন। ততদিনে তিনি পূর্ব পাকিস্তান আওয়ামী লীগের সভাপতি। সাধারণ সম্পাদক তাজউদ্দীন আহমদ তার নেতৃত্বে একটি শক্তিশালী 'সমাজতন্ত্রেই মুক্তি' ধারাকে জিইয়ে রাখেন।

৮। ১৯৬০-এর দশকে বিশ্বব্যাপী 'ইনকিলাব জিন্দাবাদ', 'দুনিয়ার মজদুর এক হও' ইত্যকার স্লোগান বিশেষ করে ধনতান্ত্রিক বিশ্বে বৈষম্যের বিরুদ্ধে উচ্চকণ্ঠ আওয়াজ ওঠে। ভারত ও পাকিস্তানে অর্থনৈতিক সক্ষমতা মুষ্টিমেয় কয়েকজনের হাতে কেন্দ্রীভূত হওয়ার পরিপ্রেক্ষিতে ব্যাংকিং ও বীমা খাতকে রাষ্ট্রায়করণ করা হয়। পাকিস্তানের ২২ পরিবার কোটিপতির (মাত্র একজন পূর্ব পাকিস্তানে) হাতে সম্পদ কুক্ষিগত করে রাখার বিরুদ্ধে প্রচণ্ড গণবিক্ষোভ দানা বাঁধে। আওয়ামী শব্দের অর্থ জনগণ। আওয়ামী লীগ সে সময় জনমতের প্রতি শ্রদ্ধা রেখে সমাজতন্ত্রকে একটি মূলনীতি হিসেবে গ্রহণ করে।

৯। উনসত্তরের বিশ্বখ্যাত গণঅভ্যুত্থানের ঢেউ আগরতলা মামলাকে ভাসিয়ে নিয়ে যায়; বিচারপতি পালিয়ে যান। মহীয়সী নারী ফজিলাতুন নেছা মুজিবের পরামর্শ গ্রহণ করে শেখ মুজিব প্যারোলে গোলটেবিলে যেতে অস্বীকার করেন। বাংলার দামাল ছেলেমেয়েরা জেলের তালা ভেঙে শেখ মুজিবকে মুক্ত করে। সর্বদলীয় ছাত্র সংগ্রাম পরিষদ এবং দেশবাসীর পক্ষে ডাকসু ভিপি তথা ছাত্রলীগ সভাপতি তোফায়েল আহমদ ২৩ ফেব্রুয়ারি ১৯৬৯-এ জনগণের প্রাণপ্রিয় সংগ্রামী শক্তির অধিকারী শেখ মুজিবুর রহমানকে বঙ্গবন্ধু অভিধায় ভূষিত করেন। অনুরূপভাবে পাকিস্তান শক্তিমান সেনা সরকারের কারাগারে আটক ফাঁসির মঞ্চে যাওয়ার অপেক্ষমাণ বঙ্গবন্ধুকে অতিশয় সম্মানের সাথে মুক্তি দেয়া হয় ৮ জানুয়ারি ১৯৭২-এ। ১০ জানুয়ারি বীরবেশে স্বাধীন বাংলাদেশের মাটিতে পদার্পণ করেন মুক্ত বিহঙ্গ বঙ্গবন্ধু। রেসকোর্সের ময়দানে জমায়েত ১০ লাখ জনতা গগনবিদারী স্লোগানে কৃতজ্ঞতার সাথে তাদের বিজয়ী বীরকে জাতির পিতা হিসেবে বরণ করে নিল।

১০। স্বাধীনতার স্বাদ গ্রহণে আনন্দ ও কৃতজ্ঞতা প্রকাশের মাঝে ওইদিন জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান বললেন, 'এই স্বাধীনতা আমার ব্যর্থ হয়ে যাবে, যদি আমার বাংলার মানুষ পেট ভরে ভাত না খায়, এ স্বাধীনতা পূর্ণ হবে না যদি, বাংলার মা-বোনেরা কাপড় না পায়, এ স্বাধীনতা আমার পূর্ণ হবে না যদি এ দেশের যুবক যারা আছে তারা কাজ না পায়। আজ থেকে বাংলায় যেন আর চুরি-ডাকাতি না হয়, লুটতরাজ না হয়।' এটিই কিন্তু মোদ্দা কথায় জাতির পিতার আজীবন সাধনা ও আত্মত্যাগের রাজনীতির মূল উপজীব্য এবং অর্থনীতির মোটা দাগের দর্শন। সমাজ সংস্কারে সুষম এবং সমতাপ্রবণ জাতিগোষ্ঠী গড়ার প্রত্যয়ও এতে ফুটে ওঠে। 'সবার সাথে সখ্য কারও সাথে বৈরী নয়' ঘোষণা দিয়ে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু সারা বিশ্বে আলোড়ন সৃষ্টি করেন। কোনো সামরিক ব্লকে যোগ না দিয়ে জোটনিরপেক্ষ থাকার সাহসী পথচলাও মুজিব ও বাংলাদেশের প্রতি বিশ্ববাসীর অসাধারণ শুভকামনা সৃষ্টিতে বিরাট অবদান রাখে। জাতীয় ও রাষ্ট্রীয় পরিমণ্ডলের সর্বক্ষেত্রে বাংলা ভাষা ব্যবহারের নীতিতে দৃঢ়কণ্ঠ ছিলেন বঙ্গবন্ধু।

১১। প্রথম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার মূল অংশের প্রথম বাক্য হলো : "2.1 Objectives of the Plan
The basic objectives of the plan are as follows:
To reduce poverty. This is the foremost objective of the plan."

পাকিস্তানি শোষণের ২৪ বছরে বাংলাদেশের মানুষ দরিদ্র হয়েছে বলে দারিদ্র্য নির্মূল বঙ্গবন্ধুর কাছে খুবই গুরুত্বপূর্ণ ছিল।

১২। মধ্যস্বত্বভোগীদের অতিরিক্ত মুনাফার কারণে উৎপাদনকারী ক্ষতিগ্রস্ত। কারণ তারা পণ্যের উপযুক্ত মূল্য

এরপর পৃষ্ঠা ৭

বঙ্গবন্ধু অবাধ বাজার অর্থনীতিতে বিশ্বাসী ছিলেন না

● ২ পৃষ্ঠার পর

থেকে বঞ্চিত হন। আবার ক্রেতাকে গুনতে হয় অতিরিক্ত মূল্য। সেজন্য জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান এ মধ্যস্বত্বভোগী উৎপাত ব্যাপকভাবে হ্রাস করার পক্ষপাতী ছিলেন। চুয়াত্তরের মনুষ্যসৃষ্ট দুর্ভিক্ষে মধ্যস্বত্বভোগী মিল মালিক মণ্ডজুদদারদের নষ্ট ভূমিকা অনেকাংশেই দায়ী ছিল। বর্তমান সময়েও প্রায় সংবৎসরের চাল, পেঁয়াজ, ভোজ্যতেল ইত্যাদি পণ্যে কৃত্রিম সংকট সৃষ্টি করে মুনাফাখোরি করা হচ্ছে।

১৩। ৫০ বছরের অর্জন ও অপূর্ণতা নিয়ে গবেষণা চলছে, চলছে লেখালেখিও। তবে মোটা দাগে কয়েকটি কথার অবতারণা না করলেই নয়। প্রবৃদ্ধি আর সামাজিক রূপান্তরের অতিরিক্ত যে বিশাল স্বীকৃতি এল আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা হিসেবে আমার মায়ের ভাষা বাংলার তার তুলনা নেই। বিশ্বব্যাংকের অন্যায় ঘাউরামির মুখে নিজেই তার ঋণ বাতিল করে শেখ হাসিনা নিজস্ব অর্থাৎ নকশা, করিগরি, ব্যবস্থাপনা ও শ্রমজীবী নিয়ে প্রায় চার মাইল লম্বা পদ্মা সেতু নির্মাণ করেছেন তাতে বিশ্বলয়ে দেশের ভাবমূর্তি অনেক অনেক উজ্জ্বল হয়েছে। অতিরিক্ত অগ্রাধিকারে রেলের কাজ ত্বরান্বিত করে জুন ২০২২-এ যদি একযোগে সেতু, সড়ক ও রেলপথ চালু হয় তাহলে অর্থনৈতিক সংযুক্তির মাধ্যমে বার্ষিক সামষ্টিক আয় প্রবৃদ্ধিতে ১.০২ থেকে ১.০৭ শতাংশ যোগ হবে, হবে কর্মসংস্থান, পণ্যের বেশি মূল্য পাবেন কিষান-কিষানীরা, পর্যটনের ঢেউ আসতে পারে। প্রতি বছর দারিদ্র্য হ্রাস পাবে শতকরা ০.৮৪ থেকে ১.০০ ভাগ। কর্ণফুলী টানেল, মেট্রোরেল, বাংলাদেশব্যাপী নদী ড্রেজিং, রেলের ব্রডগেজীকরণ ও বিদ্যুতায়ন ইত্যাকার মেগা প্রকল্প অভ্যাসে পরিণত হওয়া সময় ও খরচ বাড়ানোর দুর্নীতিতে লাগাম দিতে পারলে অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি ও সামাজিক রূপান্তরে আরো গতি আসবে। মহান স্বাধীনতার পরই কিন্তু অর্জনের দিক থেকে শীর্ষস্থানে আছে জাতিসংঘসহ বিশ্বময় শেখ হাসিনার অকুতোভয়, উদ্ভাবনী ও অসাধারণ নেতৃত্ব; এটি পদ্মা সেতু নির্মাণের পর আরো বেড়েছে, যেমনটি ইতিবাচক হয়েছে বাংলাদেশের ভাবমূর্তি।

১৪। বঙ্গবন্ধুর কাঙ্ক্ষিত ও প্রদর্শিত পথে যে দুটো কাজ করা হয়নি তার একটি হচ্ছে সমবায় ব্যবস্থা প্রবর্তন। তিনি সুস্পষ্টভাবেই গ্রামীণ সমবায় সমিতি গঠন এবং এর মাধ্যম অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ড ও সম্পদ বিতরণের কথা বলে গেছেন। উৎপাদন ও বিপণন সমবায় সমিতি গঠন, তাদের সাশ্রয়ী সুদে (৩%-৪%) ঋণদান, খাদ্য সংরক্ষণের ক্ষমতা বৃদ্ধি, এতে অগ্রাধিকারভিত্তিক সমবায়ী ধান, চাল, পেঁয়াজ, আলু রাখার ব্যবস্থা করা হলে উৎপাদনকারীরা নিজের ফসল সমবায় মাধ্যমে নিজেই কিনে গুদামজাত করবেন এবং বছরব্যাপী তা বিক্রি করে নিজেরা এখনকার চেয়ে বেশি দাম পাবেন এবং ক্রেতারা কম দামে কিনতে পারবেন। মূল্য থাকবে স্থিতিশীল। শুধু লোকসান হবে ১ হাজার ২০০ মিল মালিক আর তাদের দোসর কিছু দুর্নীতিবাজ কর্মকর্তার। মিল মালিকরা হুমকি দিচ্ছে, সরকার দাম না বাড়ালে তারা সরকারের কাছে ধান, চাল বিক্রি করবে না। দেশদ্রোহিতা নয়তো! খবর নিয়ে জানা যায়, বর্তমানে চালের মজুদ ৫.৫ লাখ টন। আতঙ্ক না হলেও ভয় লাগতেই পারে। কারণ আমনের সংগ্রহ লক্ষ্যমাত্রা অনুযায়ী হয়নি। তার মূল কারণই হচ্ছে মিল মালিক ও দুর্নীতিবাজদের কারসাজি। তথ্যানুসন্ধান বলছে, আউশের ফসল সামান্য কমে ১৫.৭ লাখ টন হলেও শুধু সংগ্রহমূল্য বাজারমূল্যের কম ধার্য করার ফলে (অন্তর্ঘাত নয়তো!) সংগ্রহ একেবারেই ছিটেফোঁটা। স্মর্তব্য যে ১৯৭৪ সালের অক্টোবরে যে দুর্ভিক্ষ সৃষ্টি করা হয়েছিল তারও মূল চাবিকাঠি ছিল মধ্যস্বত্বভোগীদের গুজব সৃষ্টি করে দাম বাড়িয়ে নবেলবিজয়ী অর্থনীতিবিদ অমর্ত্য সেনের ভাষায় রংপুর, জামালপুর ও টাঙ্গাইলের কয়েকটি এলাকার অনেকজনের 'এনটাইটেলমেন্ট' চলে যাওয়া ক্রয়ক্ষমতার অভাবে। সামগ্রিকভাবে দেশে খাদ্যশস্যের অভাব ছিল না। মঙ্গা (শেখ হাসিনা সরকার মঙ্গা শব্দটি বাংলার অভিধান থেকে উঠিয়ে দিতে পেরেছে) এলাকার চাল-গম পরিবহনের কোনো পরিকল্পনাই করা হয়নি। বন্যাজনিত ক্ষয়ক্ষতির সাথে সংযুক্ত হয় মার্কিনদের সংগতকারণে দুটো খাদ্যবোঝাই জাহাজ আগস্টের বদলে নভেম্বরে আসার কারণে। পরিকল্পনা কমিশন ও পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের উচিত ছিল পিএল-৪৮০-এর শর্তাধীনে বাংলাদেশের মতো মার্কিন খাদ্য মঞ্জুরী গ্রহণকারী দেশ সমাজতান্ত্রিক দেশ কিউবায় পাট রফতানি করলে খাদ্য মঞ্জুরী বাতিল হয়ে যাবে। সে সম্পর্কে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধুকে অবহিত করা। তারা মোটেও হোমওয়ার্ক করেনি।

১৫। বঙ্গবন্ধুর বাংলাদেশ ১৯৭৫-এর বিপর্যয় এবং মাঝে মধ্যে জনস্বার্থে উদাসীন সরকারের গদিনসীন থাকার ফলে অর্থনৈতিক উন্নয়নে বাধা এসেছে। তবে গত এক যুগে সর্বনাশা করোনার ছোবলের আগ পর্যন্ত নিরবচ্ছিন্ন ধারাবাহিকতায় বাংলাদেশের অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি এবং হৃদয় উষ্ণ করা এর সামাজিক রূপান্তর বিশ্ববাসীর সপ্রশংস দৃষ্টি আকর্ষণ করেছে। মাথাপিছু আয়ের হিসাবে ২০১৭ সালে পাকিস্তানকে এবং ২০২০ সালে ভারতকে টপকে যাওয়া সম্ভব হয়েছে। তবে আত্মপ্রসাদের কোনোই অবকাশ নেই।

১৬। দেশের কৃষককুল আমাদের খাবার অন্ন নিশ্চিত করেছেন। বস্ত্রে আমরা স্বয়ম্ভর, যদিও তৈরি পোশাকে আমদানি করা কাপড়ে এবং বন্ডের ছিদ্র দিয়ে দুর্নীতি অপব্যবহার রোধ করা জরুরি। সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য অবকাঠামো বিস্তৃত ও মজবুত হয়েছে বাংলাদেশে। শ্রমজীবী ভাইবোনেরা মাথার ঘাম পায়ে ফেলে শিল্পোৎপাদন বৃদ্ধি করেছেন। তৈরি পোশাক ও নিটওয়্যার রফতানি করে বিপুল সম্ভার দিয়ে প্রায় ৪ হাজার ৬০০ কোটি ডলারের বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভ গড়তে অবদান রেখেছেন। প্রবাসে শ্রমজীবীদের সেবায় কষ্টার্জিত রেমিট্যান্সপ্রবাহ এখন দৃষ্টিনন্দন। শূন্যের কোটায় শুরু করা বাংলাদেশের শিল্পোদ্যোক্তারা এখন বিশ্বসভায় নন্দিত।

ঙ। বর্তমান ভবিষ্যতের হালচাল ও করণীয়

১৭। করোনার কশাঘাতে অর্থনীতি বিপুলভাবে ক্ষতিগ্রস্ত। ২০১৯-২০ অর্থবছরে প্রাক্কলিত বার্ষিক সামষ্টিক আয় প্রবৃদ্ধি ৮.১ শতাংশ ছিল; অর্জন ৩.৫১ শতাংশ। অনুরূপভাবে ২০২০-২১ অর্থবছরে মূল প্রাক্কলন ৮.২ শতাংশ প্রবৃদ্ধি সংশোধন করে ৫.৪৭ শতাংশে হ্রাস করা হয়েছে; এটিও অর্জিত হয়েছে কিনা সন্দেহ থেকেই যাচ্ছে। বর্তমান বছরের ২০১-২২ বাজেটে বার্ষিক সামষ্টিক আয়ের প্রবৃদ্ধি শতকরা ৭.২ হবে বলে যে পূর্বাভাস দেয়া হয়েছে, তা অর্জনের আশা করা খুবই বাস্তবসম্মত নয়। মার্কিন অর্থনীতিতে প্রবৃদ্ধি শুরু হয়েও থেমে যাচ্ছে। ইউরোপীয় সম্প্রসারণও করোনায় আবারো হুমকির সম্মুখীন। ভারতের অবস্থাও তেমন ভালো নেই। চীন ভালো করছে। তবু দেশটি তৈরি পোশাকে পুঁজি প্রত্যাহার করছে। এর সিংহভাগ দেশান্তর হচ্ছে ভিয়েতনামে। ভিয়েতনাম, কম্বোডিয়া ও মালয়েশিয়া তৈরি পোশাক রফতানিতে বেশ ভালোভাবে অগ্রসরমান; উৎপাদনশীলতার অগ্রসরতা এবং ব্যবস্থাপনার মুন্সিয়ানা এ অর্জনের দাবিদার। বিশ্বব্যাংক বলছে, সস্তা শ্রমে নিম্ন আয়ের জন্য কম মূল্যের তৈরি পোশাক রফতানি করে বেশি দূর যাওয়া যাবে না। ডিজাইন ও গন্তব্য বহুমুখীকরণ ছাড়া পোশাক রফতানি টেকসই হবে না। বিদেশী বিনিয়োগও প্রয়োজন। আমাদের রফতানি বাড়ছে না, আমদানি স্থিতিশীল, তবে ভোগ্যপণ্য আমদানি বাড়ছে। রেমিট্যান্সপ্রবাহে আশঙ্কিত কমে যাওয়া শুরু হয়েছে। করোনার আঘাত থেকে ঘুরে দাঁড়ানোর জন্য যে সাহসী ও বিপুল প্রণোদনা প্যাকেজ সরকারপ্রধান ঘোষণা করেছেন শুরু থেকেই তার যে অংশটি কুটির, অতিক্ষুদ্র ও ক্ষুদ্র শিল্পের পুনরুত্থান ঘটানোর কথা তার সিংহভাগ অব্যবহৃত থাকছে। ফলে ক্ষতিগ্রস্তদের কর্মসংস্থান তথা আয়রোজগার শুধু যে বাড়ছে না তা নয়, আশঙ্কাজনকভাবে কমে যাচ্ছে। ফলে অভ্যন্তরীণ বিশেষ করে ভোগ্যপণ্যের খরচ দিয়ে অর্থনীতির পুনর্জাগরণের ধারাটি সচল হচ্ছে না। এ ব্যাপারে সরকার ও শিল্প বণিক সমিতিগুলো যৌথভাবে সমীক্ষা করে প্রাতিষ্ঠানিক ব্যবস্থায় কুটির, অতিক্ষুদ্র ও ক্ষুদ্র শিল্পের ধারাটিকে দ্বিগুণ আলোয় প্রজ্বালন করতে পারেন। এক্ষেতে ভেঞ্চার ক্যাপিটালের সহায়তা কাজে আসবে।

১৮। বাংলাদেশের উন্নয়ন প্রচেষ্টায় একটি বড় দুর্বলতা বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচির অপ্রতুল বাস্তবায়ন এবং বছরের শেষের দিকে তাড়াহুড়ার খরচ। ২০১৯-২০ অর্থবছরের প্রথম ১০ মাসে বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচির সংশোধিত বরাদ্দের মাত্র শতকরা ৬০ ভাগ বাস্তবায়ন হয়; আর মে-জুনে খরচ হয় শতকরা ৪০ ভাগ। মে-জুনের বৃষ্টি আর বন্যার পানির নিচে আর নদীভাঙন ও বাঁধের ফাটলে দেশের অর্থসম্পদের একটি অংশ তলিয়ে যায়, দশের তেমন কোনো উপকার হয় না। অনাচার রোধে জানুয়ারি-ডিসেম্বর অর্থবছর করার জোর সুপারিশ পুনরায় পেশ করছি।

১৯। বাংলাদেশের উন্নয়ন যাত্রাপথে সবচেয়ে লজ্জার জায়গা হলো পৃথিবীর প্রায় সর্বনিম্ন ট্যাক্স : জিডিপি অনুপাত (শতকরা ১০ ভাগের নিচে এবং প্রবণতা নিম্নগামী)। বস্টন কনসাল্টিং গ্রুপ ও মাস্টার কার্ড ২০১৬ সালেই সমীক্ষা করে দেখিয়েছে যে বাংলাদেশে ২.৫ কোটি লোকের হাতে ৫ হাজার মার্কিন ডলারের মাথাপিছু আয় এবং ভোগ্যপণ্যে চাহিদাসম্পন্ন জনগোষ্ঠী রয়েছে। অথচ কর আদায় করেন মাত্র ২৫ লাখ করদাতা অর্থাৎ করযোগ্য আয় অর্জনকারীর মাত্র শতকরা ১০ ভাগের কাছ থেকে। আর কর রাজস্ব আদায় করতে না পারলে বিনিয়োগে পাবলিক সেক্টর কীভাবে অর্থনীতির মূল চালিকাশক্তি ব্যক্তি খাতের প্রসারে সহায়ক ভূমিকা পালন করবে। এ ব্যাপারে আপৎকালীন অগ্রাধিকারে সম্মিলিত এবং আপস মীমাংসার মাধ্যমে কার্যকর কৌশল নির্ধারণ ও বাস্তবায়ন করা সম্ভব এবং উচিত।

অর্থনীতির পুনরুত্থানে এবং জাতির পিতার দর্শন: সোনার বাংলায় কল্যাণ রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠায় ব্যক্তি খাতের সব অংশীদার দৃষ্টিনন্দনভাবে সফল ও বিশ্বনন্দিত সরকারের সাথে হাতে হাত মিলিয়ে সংস্কার ও সংস্কার কর্মসূচি হাতে নিতে হবে। উৎপাদন ও রফতানিতে বহুমুখিতা নিশ্চিতের কাজ এবং সমতাপ্রবণ বিতরণ অর্থনীতি দিয়েই সংস্কার শুরু করা যায়।

ড. মোহাম্মদ ফরাসউদ্দিন : সাবেক গভর্নর, বাংলাদেশ ব্যাংক
ইস্ট ওয়েস্ট ইউনিভার্সিটির প্রতিষ্ঠাতা উপাচার্য